দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, সংজ্ঞা, প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

<u>**উদ্ভব**</u> ঃ সমাজভাষাবিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত এক আধুনিক বিদ্যা। ইংরেজিতে Sociolinguistics (সমাজভাষাবিজ্ঞান) পরিভাষাটি ১৯৫১ সালে প্রথম ব্যবহার করেন হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক হ্যাভার সি. কারি।[১] পাঁচের দশকের শুরুতেই তিনি ভাষা এবং সমাজকে সম্পর্কিত করে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে তিনি ভাষা এবং সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে - "Social functions and significations of speech factors offer a prolific field of research....The field is now designated sociolinguistics...."[২]

Sociolinguistics পরিভাষাটি ভাষাবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম প্রচলন করেন এই শাস্ত্রেরই আদি পুরুষদের অন্যতম দুজন, উইলিয়ম ব্রাইট এবং সদ্য প্রয়াত এ.কে. রামানুজন, ১৯৬২ সালে নবম আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ সম্মেলনে পঠিত এক প্রবন্ধে[৩]। অবশ্য Sociolinguistics কথাটি প্রচলিত না থাকলেও পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচনায় সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল অনেক আগে থেকে। সমাজভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। ১৮৮০ সালে জে.বি হোয়াইটমার আপাতে-অভিবাদনরীতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। পাওয়েল ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Introduction to the study of Indian language' গ্রন্থে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং তার সঙ্গে ভাষা সংগঠনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। সমকালে ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সাপির ভাষা বৈচিত্র্যের গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা দেখান। ১৯১৫ এবং ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর দুটি গ্রন্থের শীর্ষনাম ছিল যথাক্রমে ' Abnormal types of speech in Nookta' এবং 'Male and female forms of speech in yana'। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয় ম্যালিনোওস্কির তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'The problem of meaning in primitive language' সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক পর্বের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংযোজন মেরী হাস রচিত 'Men's and women's speech in Koasati'(১৯৪৪) প্রবন্ধে।[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজভাষা, সংস্কৃতি কেন্দ্রিক এই যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তারই অনুষঙ্গে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চায় জোয়ার আসে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় জে. আর. ফার্থের প্রবন্ধ 'Personality and language in Society'। ১৯৫১ সালে মার্কিন নিগ্রোদের ভাষার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের ভাষার তুলনা করে প্রবন্ধ

লেখেন ম্যাকডেভিড 'The relationship of the speech of American Nigroas to the speech of white.' নামে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ইউ ওয়েনরাইস-এর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Language in Contact' । ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় চার্লস ফার্গুসনের বিখ্যাত রচনা 'Diglossia' । তারও পরে ১৯৬০ সালে ব্রাউন এবং গিলম্যান লেখেন 'The pronouns of power and Solidarity ' ।[৫]

বস্তুতপক্ষে ১৯৬৪ সালে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশিয়োলিঙ্গুইস্টিক্স বিষয়ে যে সম্মেলন হয়, তাতেও এই তাত্ত্বিক দিকে খুব একটা জোর দেওয়া হয় নি, যদিও সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দেশ করার একটি স্পষ্ট চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছিল।[৬]

সোশিয়োলিঙ্গুইস্টিক্স নামটি কীভাবে স্থায়ীভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় গৃহীত হয় তা সম্পর্কে পবিত্র সরকার বলেছেন - ''ইদানীংকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই এলাকায় সবচেয়ে কীর্তিমান গবেষক উইলিয়াম লেবভ ১৯৭২-এ জানাচ্ছেন যে, তিনি 'সোশিয়োলিঙ্গুইস্টিক্স' নামটির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আপত্তি পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এ এক অবান্তর নামকরণ। ভাষা মাত্রেই সামাজিক। সমাজ ব্যতিরিক্ত ভাষা সম্ভব নয়। একা, মানববর্জিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর কোনো ভাষা নেই। কাজেই সোশিয়োলিঙ্গুইস্টিক্স, তা সেভাবে আলাদা কিছু নয়। লেবভ নিজে বিকল্প নাম খুঁজতে গিয়ে 'The Sociology of language, The ethnography of speaking' ইত্যাদি নামে ও প্রসঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বইয়ের নাম যখন দিলেন 'Sociolinguistics Patterns' তখন বুঝতে পারি সোশিয়োলিঙ্গুইস্টিক্স নামটিই স্থায়ীভাবে গৃহীত হয়ে গেল। [৭]

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে 'কাহ্/কার' — জাতীয় প্রকারভেদকে স্বাধীন বিকার বলে চালিয়ে দেয়া হতো। সমাজভাষাবিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্তে এলেন, ভাষা বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মূল সমাজবিন্যাসেই নিহিত। সুতরাং তাঁরা ভাষা-সংগঠন-বৈচিত্র্য এবং সমাজ-সংগঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজতে শুরু করেন। এর ফলে ভাষাবিজ্ঞানে নতুন উপশাস্ত্র সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম হলো এবং ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সংযোজিত হল নতুন মাত্রা। [৮]

পবিত্র সরকার সমাজভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন - ''মার্কিন দেশে এ নামটি ১৯৫২-র আগে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের এবং দরিদ্রদের ভাষা ইত্যাদি নিয়ে

তথ্যমূলক গবেষণা কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং এ শতাব্দীর চল্লিশের বছরগুলির মাঝামাঝি থেকে পাঁচের দশকের গোড়া পর্যন্ত ওদেশে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক ভাষা-উপভাষা বিষয়ে অনুসন্ধান-সংগ্রহ-গবেষণাতেও তেমনই 'মেথডোলজি' বা পদ্ধতি-প্রণালী গড়ে তোলার দিকেই ঝোঁক বেশি দেখা গিয়েছে। র‍্যাভেন ম্যাকডেভিড প্রমুখ গবেষকেরা চারের দশকের মাঝামাঝি থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা অঞ্চলের উপভাষার 'Social analysis' করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের ঝোঁক মূলত ছিল তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষন, অর্থাৎ বর্ণনার দিকে। এমন কী ১৯৭০ -এ যখন ম্যাকডেভিড 'The Sociology of Language' নামে প্রবন্ধ লেখেন তখনও তাঁর মনে বিষয়টির তাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চিন্তা স্থান পায়নি। উল্লেখযোগ্য গবেষণার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বার্নস্টাইনের উল্লেখ করেছেন ওই লেখায়, কিন্তু উনিশ-শো ষাটের বছরগুলি থেকে নবোদ্ভূত সমাজভাষাবিজ্ঞান যে তত্ত্বের দিক থেকেও গুরুত্ব এবং সম্ভ্রম লাভ করার চেষ্টা করছে, চমস্কির সিদ্ধান্তের একটা প্রতিবাদী ভূমি তৈরি করে, তা তিনি খেয়াল করেননি, বা করলেও উল্লেখ করতে আগ্রহ বোধ করেননি।.... কিন্তু সেই প্রস্তাব বা হাইপোথিসিসটি ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে এবং সমাজবিজ্ঞানী বার্নস্টাইনের হাতে পড়ে নতুন উজ্জীবন লাভ করে এবং হ্যালিডে প্রমুখেরা চমস্কির তুলে ধরা ভাষার অধিকার বা কম্পিটেন্স -এর ধারণার প্রতিস্পর্ধীরূপে তাঁদের সামাজিক ভাষার তত্ত্বকে তুলে ধরেন।''[৯]

সমাজভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভবের কারণ বলতে গিয়ে পিটার ট্রাজিল বলেছেন - 'One of the main factors that had led to the growth of sociolinguistic research has been the recognition of the importance of the fact that language is a very variable phenomenon and this variability may have as much to do with society as with language (1987, 32)'। এই প্রসঙ্গে আর. এ. হাডসন বলেছেন - 'Speech has a social function, both as a means of communication and also as a way of identifying social groups, and to study speech without reference to the society which uses it is to exclude the possibility of finding social explanations for the structures that are used.' (1986, P- 4)।[১০]

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঃ সমাজভাষাবিজ্ঞান ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্যে মূলত কার কার হাত ধরে ক্রমবিকশিত হয়েছে তার তথ্য নিম্নে দেওয়া হল —

জে. জে. গাম্পার্যঃ

i. Language problem in rural development of north India (1957)

ii) Dialect differences and social stratification in a north Indian village (1958)

iii) Linguistic diversity in South Asia (1960 - ফার্গুসন সহ রচনা)

গাম্পার্য তাঁর এইসব রচনাকর্মের সূত্র ধরে ' Ethnography of communication ' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তত্ত্বটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন - 'Whereas linguistic competence covers the speaker's ability to produce grammatically correct sentences, communicative competence describe his ability to select from the totally of grammatically correct expressions available to him, forms which appropriately reflect the social norms governing behaviors in specific Encounters'[১১] সমাজভাষাবিজ্ঞানে Linguistic repertoire Patterns (বুলিভান্ডার) পরিভাষাটিও তাঁর সংযোজন।

ডেল হাইমস ঃ

i) The ethnography of speaking (1962)

ii) Language in culture and society (1964)

iii) Competence and performence in linguistic theory (1971)

iv) Foundation of Sociolinguistics : An ethnographic approach (1974)

ডেল হাইমস সমাজভাষাবিজ্ঞানে 'Ethnography of speaking' তত্ত্বের প্রবক্তা। এছাড়াও তিনি 'Communicative Competence' (ভাব বিনিময় যোগ্যতা) পরিভাষাটি সমাজভাষাবিজ্ঞানে সৃষ্টি করেন। ডেল হাইমস মনে করেন যখন কোনো মানুষ কোনো একটা ভাষা বলতে শেখে তখন তার পক্ষে সেই ভাষার ব্যাকরণগত সূত্রাবলী এবং শব্দভান্ডার শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, ব্যাকরণের নিয়ম বা সূত্রের বাইরেও রয়েছে সমাজের সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিবেশ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে হবে। ব্যাকরণের সূত্রাদি ও শব্দভান্ডারের পাশাপাশি কোন বিশেষ সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হয়ে বাক্ প্রয়োগ তথা ভাব বিনিময়ের এই যে বিষয়টি ডেল হাইম্স তাকেই বলেছেন ' Ethnography of speaking ' – কথনের নৃবৃত্ততত্ত্ব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ডেল হাইম্স তাঁর আলোচনায় 'Ethnography of speaking' এর কথা বললেও সেখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যে, কথন নয় সংজ্ঞাপনই হল মূল বিষয়। তাই শেষাবধি গাম্পার্যের তত্ত্বকে তিনি মেনে নেন। ডেল হাইম্স মূলত একজন নৃতাত্ত্বিক কিন্তু তবু তিনি আচরণের ব্যাখ্যা করার জন্য নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরে এসে

কথনের নৃবৃত্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যা ব্যাকরণিক ও নৃবৃত্ততাত্ত্বিক বর্ণনার ফাঁককে পূরণ করে দেয়। ডেল হাইম্‌স প্রথমে ভেবেছিলেন কথন বা ভাষাই হল মূল কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন ভাষা নয় সংজ্ঞাপনই হল মূল বিষয়, তিনি বলেছেন - ' It is not that linguistics does not have a vital role. Analysed linguistic materials are indispensable, and the types of linguistic methodology is an influence in the ethnographic perspective. It is rather that it is not linguistics, but ethnography,not language, but communication, which must provide its frame of reference within which the place of language in culture and society is to be assessed .'[১২]

জোশুয়া ফিশম্যান ঃ

i. Who speaks what language to whom and when (1965)
ii) Readings in the sociology of language (1968)
iii) Advances in the sociology of language (1972)

ফিশম্যানের উপরি উক্ত তিনটি গ্রন্থের উপর আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তাঁর 'Sociology of language' তত্ত্বটি। ফিশম্যান দেখিয়েছেন মানুষ প্রতিদিনের সমাজ জীবনে 'Interaction' বা অনোন্যক্রিয়ার ক্ষেত্রে কখনো একটি ভাষা, কখনো একই ভাষার বিভিন্ন বুলি বা উপভাষা ব্যবহার করে। অর্থাৎ কোনো বাক সম্প্রদায় কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ধরণের ভাষা ব্যবহার করে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেলে তার ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিভিন্ন ধরণের এইসব পরিস্থিতিকে ফিশম্যান বলেছেন 'Social situation' বা সামাজিক পরিস্থিতি। এই সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন - "...The implementation of the rights and duties of a particular role relationship, in the place (locate) most appropriate or most typical for that relationship and the time societally defined as appropriate for that relationship.'[১৩]

উইলিয়াম লেবভ ঃ

i. The social stratification of English in New York City.(1966)
ii. The study of language in it social context (1971)
iii. Hypercorrection by the lower middle class as a factor in linguistic

change (1972)

উইলিয়াম লেবভ সমাজভাষাবিজ্ঞানকে সবচেয়ে বেশি পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি ১৯৬১ সালে 'Martha's Vineyard' নামের একটি দ্বীপের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি ১৯৯৪ ও ২০০১ সালে যথাক্রমে লেখেন -

Principles of Linguistic. I : International Factors.
Principles of Linguistic change, II : Social Factors

নিউইয়র্কের (১৯৬৬) উপর তাঁর কাজটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী। এই গ্রন্থে /r-/ ধ্বনি নিয়ে তিনি মূল্যবান গবেষণা করেন।

উপরি উক্ত সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ছাড়াও আরও অনেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। তাদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তারা হলেন - আরভিন - ট্রিপ, বেসিল বার্নস্টেন, উইলিয়াম ব্রাইট, পিটার ট্রাডগিল, হাউগেন, চেম্বার্স, এ. বেল প্রমুখ।

বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে খুবই কম কাজ হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী রচনা হল -

১। সুকুমার সেন - বাংলায় নারীর ভাষা
২। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী - নারীর উক্তি
৩। নির্মল দাশ - উত্তরবঙ্গের নারীর ভাষা
৪। সাইফুল্লা - উত্তর ২৪ পরগনার নারী ভাষা
৫। সুজিত দাস - নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের ভাষা
৬। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক - অপরাধ জগতের ভাষা
৭। রুমানা আফরোজ - ঢাকা শহরের বিহারিদের ভাষা
৮। পি. এম সফিকুল ইসলাম - রাজশাহীর উপভাষা
৯। শর্মিলা বসু দত্ত - বাংলায় মেয়েদের ভাষা

এছাড়াও হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী, সুহৃদকুমার ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অদিতি মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার কুন্ডু, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের

নানান দিক নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন।

বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের দিক নির্দেশক হিসেবে বই লিখেছেন-

১। পবিত্র সরকার - ভাষা, দেশ, কাল (১৪০৫)
ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ (১৪০৯)
২। রাজীব হুমায়ুন - রূপসী সন্দীপ (১৯৮০)
সমাজভাষাবিজ্ঞান (২০০১)
৩। মৃণাল নাথ - ভাষা ও সমাজ (১৯৯৯)
৪। মনসুর মুসা - ভাষা পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব (১৯৮৫)
৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী - নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ (২০০৬)
৬। হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত - বাঙলা ভাষা (২য়) (১৯৮৫)
৭। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত - বাঙালির ভাষাচিন্তা, সমাজভাষা (২০০৩)

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ঃ সহজভাবে বলতে গেলে সমাজ ও ভাষার সম্পর্ক বিচার করে যে শাস্ত্র তাই সমাজভাষাবিজ্ঞান।[১৪] সামাজিক অবস্থান, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাষা রীতিও পরিবর্তিত হয় – এই আলোচনাই হল সমাজভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য। অন্যভাবে বলা যায় ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষা - সংগঠনের ওপর সমাজ - সংগঠনের প্রভাব বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়, তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে।[১৫]

ভাষা ও সমাজের পারস্পরিক তথা আন্তঃসম্পর্ক এই শাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়। পবিত্র সরকার বলেছেন - “ উইলিয়াম ব্রাইট আমাদের সর্বপ্রথম একটি কাজ চালানোর মতো পরিচয় দিয়েছিলেন এই শাস্ত্রের - ‘Linguistic DIVERSITY is precisely the subject matter of sociolinguistics.’ ওই ‘ diversity ’ বা ভাষাবৈচিত্র্য যে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক নয়, পরন্তু সামাজিক স্তরভেদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা তিনি আমাদের ঠিক আগের পংক্তিতেই জানিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে খ্যাততর বিশেষজ্ঞ ফিশম্যান (J. A Fisherman), যিনি ‘Sociology of language ’ এবং ‘Sociolinguistics ’ কথা দুটিকে পরস্পরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেন। তিনি একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন এইভাবে - ‘The sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related to social organization of language behaviour, including not only language usage per se but also language attitudes, overt

behaviour towards language and towards language users. ' অর্থাৎ সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য, তারই সঙ্গে আলোচ্য বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণ।''[১৬]

ট্রাজিল (২০০০) বলেছেন– 'The aim of sociolinguistic investigation is to achieve a further progress in the knowledge of nature and the operation of human language by the study of language in its social context. Besides, all sociolinguistics is language and society but, however, not all language and society are sociolinguistics."

ইন্টারনেটে[১৭] সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে পাওয়া যায় -
*Sociolinguistics is the descriptive study of the effect of any and all aspects of, including cultural, expectations, and context, on the way is used, and the effects of language use on society.

* The focus of sociolinguistics is the effect of the society on the language.
* It also studies how language varieties differ between groups separated by certain social variables, e.g., ethnicity, religion, status, gender, level of education, age, etc.]

আমরা তাহলে বলতে পারি সমাজভাষাবিজ্ঞান হল, ভাষাবিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিরূপিত করে। যার দ্বারা বয়স, লিঙ্গ, পেশা, ধর্ম, পরিস্থিতি, জাতি, বাসস্থান, শ্রোতা, উপলক্ষ্য, অর্থভেদে ভাষাকে বিশ্লিষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং ভাষাবিজ্ঞানের যেই শাখায় দ্বিভাষিকতা, কৃত্রিম ভাষা এবং মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতি, বানান বিধি আলোচিত হয়। তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ঃ ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার দুটি প্রধান ধারা রয়েছে। একটি তত্ত্বগত অপরটি হল অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণ নির্ভর।[১৮] সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে। সমাজ ব্যতীত ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ জনমানবশূন্য অর্থাৎ সমাজহীন পরিবেশে একজন শিশু কখনোই ভাষা শিখতে পারে না। সে শিখলে

শিখতে পারে পশুর মতো কতকগুলি অস্পষ্ট ও অর্থহীন ধ্বনি। কথিত আছে মিশরের রাজা সাম্মোইকাস পৃথিবীর প্রাচীন মানবজাতি কারা তা নির্ণয়ের জন্য একটি পরীক্ষার আশ্রয় নেন।[১৬] তিনি দুইটি সদ্যোজাত মানব শিশুকে নির্জন স্থানে রেখে আসেন। কালক্রমে তারা বড় হয়ে উঠলেও তারা কেউই কথা বলতে শেখেন নি। এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে, শিশু দুইটির কথা বলতে না পারাটাই স্বাভাবিক। কেননা সামাজিক মানুষই কেবল ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। সমাজই হল মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাষা-শিক্ষক। যেহেতু পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কার্যকরার ক্ষমতা সকলের সমান নয়, ফলে একজন সামাজিকের সঙ্গে অপর সামাজিকের পার্থক্য দেখা দেয়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ভাগ করেছেন ফিশম্যান।

১। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Descriptive sociology of language)
২। সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান (Dynamic) ও
৩। প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Applied)

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে বক্তা, শ্রোতা, রেজিস্টার, কোড সুইচিং, দ্বিবাচন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিভেদে ভাষা পরিবর্তনের দিকটি আলোচিত হয়। সচল বা পরিবর্তমান শাখায় সমাজভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, বিস্তার-সঙ্কোচন, দ্বিভাষিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং প্রয়োগমূলক সমাজভাষা-বিজ্ঞানে ভাষা পরিকল্পনা অর্থাৎ মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতি, অনুবাদ, বানানবিধি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা কী হবে সে সম্পর্কে ফিশম্যান একদা বলেছিলেন “The sociology of language focuses upon the entire gamut of topics related to social organization of language behaviour including not only language usage perse but also language attitudes, Overt behaviour towards language and towards language users.” অর্থাৎ সমাজ, সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তারই সঙ্গে আলোচ্য বিষয় ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণ। একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর আলোচনায় উঠে আসবে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক। তার পাশাপাশি আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান করে নেবে বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে সামাজিক মানুষের মনোভাব, আচরণ প্রভৃতি।

ডেল হাইমস সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা নিয়ে কিছু না বললেও তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন -

১। সমাজ সমান্তরাল ভাষাতত্ত্ব

২। সমাজ বাস্তবতার ভাষাতত্ত্ব ও

৩। সমাজভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব

সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই তিনটি উদ্দেশ্যকে পর্যালোচনা করলে শাস্ত্রটির সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সমাজের সামাজিক মানুষেরা বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে জড়িত। সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভাষা শিক্ষা, ভাষা ব্যবহার বিষয়ক নানান সমস্যার দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পাবে। আবার কোনো সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভাষায় বিভিন্ন রকমের পার্থক্য বজায় থাকে। একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানী তাঁর আলোচনায় ব্যক্তি, শিক্ষা, পেশা, সংস্কৃতিভেদে ভাষার এই যে পরিবর্তন সেই বিষয়ে আলোকপাত করবেন। [২০]

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা বিষয়ে ম্যাকডেভিড, ব্রাইট, লেবভ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় মৃণাল নাথ সেই সীমানা নির্ণয়ে কিছুটা স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মোট চারটি ভাগে আলোচ্য বিষয়কে ভাগ করেছেন। যথা-

১। অন্যোন্যক্রিয়াবাচক আক্রম(Interactional)

২। পরস্পরসম্বন্ধী আক্রম(Correlation)

৩। ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ আক্রম (Language change and language contact)

৪। ভাষা সমস্যার আক্রম (Language problems)

পরস্পরসম্বন্ধী আক্রমে মৃণাল নাথ ভাষা বৈচিত্র্য, রেজিস্টার, রীতি, দ্বিবাচন, বয়স, লিঙ্গ, জাতি, নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, উপভাষা, সামাজিক শ্রেণি, সমাজোপভাষা, সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত কোড, ভাষা মনোভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যা আমাদের গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়। তবে আমরা ফিশম্যানের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে স্মরণে রেখে গবেষণায় অগ্রসর হয়েছি।

প্রাসঙ্গিকতা ঃ ড. সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছিলেন 'কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা ছাঁদকে উপভাষা (Dialect) বলে।' তিনি উপভাষার সীমানাই শুধু নির্দেশ করেননি সঙ্গে উপভাষাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে তাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। উপভাষা নিয়ে চর্চা এরপর দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। অনেক জেলা, অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গবেষণাপত্র বেরিয়েছে। সেই সব গবেষণাপত্রে যে সব ভাষার বৈশিষ্ট্য

উল্লিখিত হয়েছে, তা সব সময় ড. সেনের উপভাষাগত যে অঞ্চলবিভাগ ও তার ভিত্তিতে বৈশিষ্ট্য নিরূপণ তার সঙ্গে অভিন্ন হয় নি। ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা', ড. নির্মল দাশের 'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ,' ড. জীবন কুমার ঘোষের 'উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের জনগনের কথ্যভাষাঃ একটি ভাষা তাত্ত্বিক সমীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ড. সেনের মত অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের ভাষা যদি বরেন্দ্রী ও কামরূপী হয় তাহলে উপরি উক্ত গ্রন্থ ও গবেষণা পত্রগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক, শব্দভান্ডার ও শব্দার্থতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি ড. সেনের সঙ্গে অভিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু তা কি হয়েছে? মোটেই হয়নি। তাহলে কোথাও কী একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমরা একই অঞ্চলের ভাষাকে যদি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দেখতে পাই, যা সার্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা, তাহলেও কি সেই সার্বিক ও সাধারণ ছাঁচে নিজেদের স্বতন্ত্রতাকে বিলিয়ে দেব। নাকি সেই বৃহৎ অঞ্চলকে খন্ড খন্ড করে ছোট ছোট দলে বা এলাকায় বিভক্ত করে তাদের ভাষাতাত্ত্বিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরব।

আমরা কি জোর গলায় কেউ বলতে পারব যে, বরেন্দ্রী উপভাষার সমস্ত মানুষ একই ধর্মের। তারা ধর্মগত একই শব্দ প্রত্যেকে ব্যবহার করে। তারা প্রত্যেকেই **'ওজু' দোয়া, প্রার্থনা, পূজা, শুচিবস্ত্র, নামাজ, খোদা হাফেজ, প্রসাদ, অঞ্জলি** - রূপিমগুলি প্রয়োগ করে।

অ>আ নাকি অ>ও কোনটি বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। আমরা **অসুখ> আসুখ, ওসুখ, আশুক, ওশুক** এই উচ্চারণগুলি বরেন্দ্রী উপভাষার অঞ্চলে সন্ধান পেয়েছি। সুকুমার সেন বলেছেন পদের গোড়ার র - কারের আগম ও লোপ বরেন্দ্রী উপভাষার একটি বিশিষ্ট লক্ষন। যদি তাই হয় তাহলে **রোদ**-কে মুসলিমরা **রইদ,** পলিয়ারা রোউদ বলে কেন? জ-কার Z ধ্বনির মতো করে উচ্চারিত হয় শুধু কপালী সম্প্রদায়দের ক্ষেত্রে। বাকি কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের মুখে তা শোনা যায় না। তাহলে 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা,' গ্রন্থে রামেশ্বর শ-এঁর বলা বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে বরেন্দ্রীতে 'জ' প্রায়ই ' Z ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় মতটি সঠিক নয়। অধিকরণ কারকে শুধু 'ত' নয় বরেন্দ্রী উপভাষায় 'এ' বিভক্তিও দেখা যায়। যেমন - **আমাগো পুহুরে এইবার ভারিভারি মাশ ঐশে।**

এই বাক্যটির 'পুহুর' এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে অধিকরণের পদ তৈরি করেছে। অতীত কালের উত্তম পুরুষে ড. সেনের মতে বরেন্দ্রী উপভাষায় - লাম বিভক্তি যুক্ত হয়। অথচ বরেন্দ্রী উপভাষায় -'লাম' বিভক্তির প্রচলন খুবই কম। শুধু কপালীরা তা ব্যবহার করে। আর অন্যান্য কোনো

সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না কখনোই। **আমি এনেছিলাম** এই বাক্যটিকে **মুই আনিছুনু, মুই আনিয়ানু, মুই আনিশুনু** রূপে দেখা যায়। কোনো উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কথ্যভাষার উপর যাচাই করে লেখা হয়। বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিও সেই নিয়ম মেনেই লেখা হয়েছে তা আমরা যদি ধরি, তবে দেখব সুকুমার সেনের দ্বারা লিখিত অধিকাংশ বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ত্রুটিপূর্ণ। যদিও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশের ফলে এই স্পর্ধিত মন্তব্য করার সাহস পাচ্ছি আমরা আজ। সুকুমার সেন যখন গ্রন্থটি লেখেন তখন একথা বলা যেত না।

উপভাষা বলে কিছু হয় না। কারণ কয়েকটি জেলা তো দূরের কথা, একই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেই ভাষার বহুবিচিত্র রূপ সক্রিয় থাকে। যাদের ধ্বনি, রূপ, বাক্য শব্দগত প্রভেদ প্রচুর থাকে। তাই তাদের সাধারণীকরণ করাটা দুরূহ ব্যাপার। একই পঞ্চায়েত এলাকায় কেউ বলে - **কেৎ জাহিশ্ ত্যা?**

অন্যেরা বলে -

কুত্তিনা জাছি?

কুন্ঠি জাছি?

কুন্না জাইশ্তে কুর?

কোন্টে জাশু ?

কুন্না জাছি বো?

কোন্ঠে জেছিস্ রে?

তাহলে আমরা বাক্যের কোন রূপটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে সাধারণ মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করবো। অনেকেই বলতে পারেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিদের ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে তো সমস্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক সমপরিমাণে বসবাস করে না। কোন পঞ্চায়েতে পলিয়া বেশি, কোনটায় বা কপালী। তাহলে কি প্রত্যেক পঞ্চায়েত ভেদেই আমরা একটি করে উপভাষার ভাগ করবো। তাও তো অসম্ভব ব্যাপার। আবার এমনও দেখা গেছে যে, কোন পঞ্চায়েত এলাকায় মাত্র দুটি ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে - হিন্দু ও মুসলিম। সেক্ষেত্রে ভাষা কি ধর্মগত মর্যাদায় ভূষিত হবে? যদি তাই হয় তাহলে সমস্যা হল, ধর্মীয় ভাষা তো স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার মীমাংসা কি করে সম্ভব!

উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রী অঞ্চলেই মালদার দিকে কোনো জায়গা বিক্রির জন্য লেখা থাকে **এই জায়গা**

বিক্রয় আছে। আবার বালুরঘাটের দিকে দেখা যায় **এই জায়গা বিক্রয় হইবে**। বিজ্ঞাপন দাতার উদ্দেশ্য একটাই হলেও ভাষাভঙ্গি তাদের অভিন্ন নয়। বালুরঘাটের দিকে বা বলা ভালো দক্ষিণ দিনাজপুরের কোথাও **এই জায়গা বিক্রয় আছে** লেখা থাকে না। তাহলে কি স্থানভেদে বাক্য তার ভাব প্রকাশের ভঙ্গি পরিবর্তন করছে না। **হামি ওকে তখন থিক্যা ঢুরছি, ও তো কখোন লিয়ে চোইলে গ্যাছে, তুই লিবি কি?, শাইকেলটা হঠিয়ে দেতো** - এইসব বাক্য মালদা জেলা ছাড়া অন্যত্র শোনা যায় না। তাহলে একই উপভাষার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের মধ্যেই তো ভাষার রূপ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল নামক গ্রামের এক ব্যক্তিকে আমরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তার কয়টি ছেলে-মেয়ে? উত্তরে সেই ব্যক্তিটি বলেছিলেন **মাইটাই নিছ্যা, তিনটা খালি নুনু**। 'মাই'-এর অর্থ যে 'স্তন' এবং নুনু' মানে যে 'শিশ্ন' তা তিনি জানেন। অথচ মানুষের গোপনাঙ্গ দিয়ে তারা ছেলে-মেয়ে নির্দেশ করে জেনে হতবাক হই। 'মাইয়া' থেকে 'মাই' হয়েছে একথা তাকে আমরা বললে তিনি পুরোপুরি তা অস্বীকার করেন। এবং পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে তারা সজ্ঞানেই গোপনাঙ্গ দিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করে ছেলে-মেয়ে বোঝান। পুরো উত্তরবঙ্গে আমরা এই ধরণের বাক্য কখনও আর শুনিনি। আমরা ইটাহার থানার ভদ্রশীলা নামক গ্রামে যে ধরণের ভাষা শুনেছি তা আবার অন্যান্য স্থানে শ্রবনসুলভ নয় -

ক- ভাল ছিশ্?
খ- হ্যা ছু। তমরা ক্যামন ছ্যান্?
ক- ভালয় ছি। কুন্দিন্ ফের আশিয়ান?
খ- ওব্বার্।
ক- তাহাও হামার পাক্যা ভ্যার্বা নি আশিয়ান্!
খ- হের্ শময়্যা নি হল্যা।
ক- অ্যাখন্ ত শময় নি পাল্ জাবে।

কুশমন্ডি থানার মহীপালের ভাষার সঙ্গে বংশীহারি থানার শিবপুর অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাষার মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাপারটি তুলে ধরছি -

<u>মহীপাল</u>	<u>শিবপুর</u>
খাওয়া জাবানে।	খাওয়া জাবিনা।
মুই জাবানু।	মুই জামনা

মুই আইশবাইনু।   মুই আশিমনা

জাবানিশ্ ক্যান্যা?   জাবুনা ক্যানা?

অর্থাৎ একই মহকুমার অন্তর্গত এবং একই ধর্মের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও থানাগত পরিবর্তনের ফলে এখানে ভাষার পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনকে উপভাষার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে ধরা কখনোই সম্ভব নয়।

কে খুন করেছে? - বাক্যটির উত্তর স্থানভেদে বা জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হবে। কেননা 'খুন' এর অর্থ কারো কাছে 'হত্যা' কারো কাছে গর্ত বা বিবর।

টাহি মাশ্যার নাগাল তাও দর্চাশ্ না। - বাক্যটি বরেন্দ্রী উপ ভাষার অঞ্চলেই শোনা যায়। অথচ যে সম্প্রদায়ের লোকেরা বাক্যটি বলে তাদের ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়েরই লোক বাক্যটির অর্থ বলতে পারেনি। বাক্যটির অর্থ হল - চ্যাং মাছের মতো গুম মেরে থাকা। ভাষার এই অর্থগত পরিবর্তনকেও উপভাষায় সবসময় ধরা যায় না। কেননা বাক্যটি বঙ্গালী উপভাষার, তাই তাকে বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্লেষণ করাটা উপভাষার নিয়ম বহির্ভূত।

শুধু জাতি, ধর্ম, স্থানভেদে নয় আমাদের সমাজে এমন কিছু ভাষা রয়েছে যাকে উপভাষার নিরিখে বিশ্লেষন করা যায় না। যেমন—

ক- পরে কোনো লাফ্রা হবে নাতো?

খ- হলে হবে।

ক- মালটাকে কি সত্যি টোপকে দেবে?

খ- দ্যাখা যাক বেশি ক্যালালে টপকাতে হবে।

ক- আইটেমটা ঘুমাচ্ছে কি শালা। তুলে তাড়াতাড়ি গ্যারেজ কর। ফোন করে বল রোখ্রা পেলেই ছেড়ে
দেব। বেশি ফ্যাচালে খাল্লাশ্ করে দে।

আমরা যদি বলি উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটি কোন উপভাষার অন্তর্গত? তবে সমস্যায় পড়তে হবে। কেননা সুকুমার সেন নির্দেশিত কোনো উপভাষারই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না দৃষ্টান্তটি। তবে কি এটি মান্যচলিতের দৃষ্টান্ত? তাও তো না। কেননা 'চলন্তিকা' তে - দৃষ্টান্তটিতে প্রযুক্ত অনেক শব্দের অনুসন্ধান করেও হদিশ পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষা বলতে যদি বাংলায় কথা বলা লোকেদের ভাববিনিময়ের বাঙ্ময় মাধ্যম

বুঝি – যা সর্বজনবোধ্য, তবে তো উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তটিকে বাংলা ভাষাও বলা যায় না। কেননা দৃষ্টান্তটি সবার কাছে বোধগম্য নয়, এবং সংলাপগুলিতে ব্যবহৃত অনেক রূপিম সাধারণের মুখে বারবার ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয় না। এইভাবে ভাষা বিজ্ঞানে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যার দ্বারা সমাজ ও ভাষার সম্পর্কই শুধু নির্ধারণ করা হয় না, উপরন্তু ভাষা সংগঠনের ওপর সমাজ সংগঠনের প্রভাবও ব্যাখ্যাত হয়। সমাজে ভাষার এমন কোনো রূপ পাওয়া যায় না যাকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, শিক্ষা, আয়, শ্রোতা, বক্তা, ধর্ম, পরিস্থিতি, বাসস্থান, স্থান, সময়, জাতি ও উপলক্ষ্যভেদে ভাষার যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের রীতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই জন্যই বর্তমান কালে উপভাষাচর্চা অপ্রাসঙ্গিক ও সমাজভাষা বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। সর্বোপরি রয়েছে দ্বিবাচন, কৃত্রিম ভাষা, কোড সুইচিং, দ্বিভাষিকতা এবং ভাষা পরিকল্পনার নানান দিক যা সমাজ ভাষাবিজ্ঞান চর্চাকে দিয়েছে অন্য মাত্রা।

তথ্যসূত্র

১। ভাষা ও সমাজ, মৃণাল নাথ, নয়া উদ্যোগ , কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ- ১১
২। এ প্রোজেকশন অব সোসিও লিংগুইস্টিক, দি রিলেশনশিপ টু সোস্যাল স্ট্যাটাস, এইচ. সি. কুরি, পৃঃ- ২৮-৩৭
৩। মৃণাল নাথ, ঐ, পৃঃ - ১১-১২
৪। উত্তর ২৪ পরগনার নারী-ভাষা, সাইফুল্লা, গবেষণাপত্র, ২০০৬, পৃঃ ৩-৪
৫। সাইফুল্লা, ঐ, পৃ- ৪
৬। ভাষা দেশ কাল, পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৪১৯, পৃঃ- ১৫৪
৭। পবিত্র সরকার, ঐ, পৃঃ-১৫৫
৮। সমাজভাষাবিজ্ঞান, রাজীব হুমায়ুন, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ - ১৪
৯। পবিত্র সরকার, ঐ, পৃঃ-১৫৪
১০। রাজীব হুমায়ুন, ঐ, পৃঃ- ১৪-১৫
১১। সাইফুল্লা, ঐ, পৃঃ - ৫
১২। দি এথনোগ্রাফি অব স্পিকিং, ডেল হাইমস, পৃঃ-১৫-৩৩
১৩। অ্যাডভান্স ইন দি সোশিয়োলোজি অব ল্যাঙ্গুয়েজ, জে. এ. ফিশম্যান, দি হগ, মাউন্টেন, ১৯৭১, পৃঃ-৫০
১৪। মৃণাল নাথ, ঐ, পৃঃ - ১১
১৫। রাজীব হুমায়ুন, ঐ, পৃঃ- ১১
১৬। পবিত্র সরকার, ঐ, পৃঃ ১৫৫
১৭। http//en.wikipedia.org/wiki/sociolinguistics
১৮। নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ইন্দাস, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ - ১১৪
১৯। সাইফুল্লা, ঐ, পৃঃ- ৭
২০। সাইফুল্লা, ঐ, পৃঃ - ৮